Samakal – Prabandho – Others – Satinath Bhaduri Ð Jiban O Sahitya – Alak Mandal

সমকাল - সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ জীবন ও সাহিত্য - অলক মণ্ডল

ভারতের স্বাধীনতা - প্রাপ্তি মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিকতার অবসান, কল্লোলীয় বোহেমিয় পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমুগ্ধতার বিদায় - এসবই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এলেন নতুন লেখকবৃন্দ। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে সেই ধারার নবতম সংযোজন সতীনাথ ভাদুড়ী, (১৯০৬ - ১৯৬৫) সতীনাথ ভাদুড়ীর পিতা কৃষ্ণনগরের ভাদুড়ী বংশের সন্তান কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ২৬ বছর বয়সে ১৮৯৫ সালে পূর্ণিয়া জেলায় এসেছিলেন আইন ব্যবসা করতে এবং অচিরে উকিল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ১১ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) বিজয়া দশমীর দিন পূর্ণিয়ায় ইন্দুভূষণ আর রাজবালার ষষ্ঠ সন্তান সতীনাথের জন্ম হয়।

সতীনাথের পূর্ণিয়ার স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়। পূর্ণিয়াতে তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে। কৈশোরেভারতীয় রাজনৈতিক গরম বাতাসের আগুনে আঁচ তাঁকে কতখানি ছুঁয়েছিল তা অনুমান করা যায়। একটি খাঁটি তথ্য আমাদের জানাআছে। পুলিশি ধর পাকড়ের যুগে সেই ত্রস্ত কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পুড়িয়ে ফেলেছিল। যুবকালে সেই সতীনাথ আকশনের কালে রিভলবার সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন সতীনাথ। স্কুলের যে পরীক্ষায় (১৯২৮ সালে) পাটনা জেলা স্কুল থেকে ডিভিশন্যাল স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন)। ১৯২৬ সালে পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করেন এবং ১৯৮২ সালে সাম্মানিক অর্থনীতিতে বি.এ., ১৯৩০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ করেনএবং ১৯৩১ সালে পাটনা ল কলেজ থেকে আইনের বি.এল. ডিগ্রি নেন। ১৯২৮ সালে মা রাজবালাকে চিরকালের জন্য হারান সতীনাথ। সতীনাথের আশ্রয় ও ভরসার একমাত্র অঙ্গন ছিলেন রাজবালা। সতীনাথের সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছিলেন তাঁর মা।

পাটনা থেকে আইন পাশ করে সতীনাথ পিতার সহকর্মী হিসেবে ওকালতি করেন সাত বছর (১৯৩২ - ১৯৩৯)। প্র্যাকটিসের চেয়ে পড়াশুনোর প্রতি বেশি আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন। বার লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রায়শই তিনি বইয়ের কালো অক্ষরের মধ্যে ডুবে থাকতেন। কেবলমাত্র আইনের বই নয়, বিচিত্র বিষয়ের প্রতি সতীনাথের কৌতূহল ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন সাহিত্য নানা বিষয়ে তাঁর পড়াশুনো ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এছাড়া নতুন ভাষা শেখার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

ছাত্রাবস্থা থেকেই নানাবিধ কাজের মধ্যেও আহারান্তিক রাতে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন নিয়মিত। সম্ভবত ১৯৩১ সালে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়! বিচিত্রায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম গল্প 'জামাইবাবু' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) 'নবশক্তি'তে প্রকাশিত হয় (৪ ভাদ্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৩১ সাল) প্রবন্ধ 'ইংল্যাণ্ডে গান্ধীজি', গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসময় (১৯৩১ - ৩২) পূর্ণিয়ায় এসে পড়েছিল। সে সময় গান্ধীজির ডাকে ঘরের লোক পিকেটিং-এ নেমে পড়েছে পথে। সতীনাথও ভিড়ে গিয়েছেন পিকেটারদের সঙ্গে। আবগারি দোকানের সামনে পিকেটিং করেছেন মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে, পিকেটিং করেছেন। জেলা স্কুলের সামনে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে। ১৯৩৪ সালে পূর্ণিয়ার গান্ধীজি এসেছিলেন, তাঁর ভাষণও শুনেছিলেন। সতীনাথের ভিতরে একটা পরিবর্তন চলছিল। তারপর ১৯৩৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সতীনাথ যোগ দিলেন গান্ধী আশ্রমে, সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে এবং জাতীয় কংগ্রেসে সত্যগ্রহের আহ্বান, গান্ধীজির ভাষ্য সতীনাথকে স্পর্শ করেছিল। এর মধ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাজনীতি তাঁকে যতটা না টানতো, তার থেকে বেশি টানতো মানুষের জন্য ভালোবাসা।

সমাজবোধ আর দেশচেতনায় তাড়িত হয়ে তিনি রাজনীতিতে আসেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সমাজ, দেশ, দেশের মানুষ স্বাধীনতার লড়াই ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর মনে নানাবিধ জিজ্ঞাসা মুখর হয়ে উঠেছিল। মুখরিত সেই জিজ্ঞাসার সমাধানে তিনি কখনো র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছেন, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাভাবনার শরিক হয়েছেন। আবার কখনো সমাজবাদী দলের প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছেন। গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে রাজনীতি শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, তাই মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্রবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে সতীনাথের ছিল স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা এবং পরিচ্ছন্ন জ্ঞান।

অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সতীনাথ যেমন ছিলেন আপোষহীন প্রতিবাদী চরিত্র, তেমনি সমাজ বা দেশসেবামূলক কাজের প্রতি বরাবরই তিনি আগ্রহ অনুভব করেছেন। নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী, নিস্পৃহ, সংসার উদাসীন। নিজের সম্পর্কে - রাজনীতিক ও সাহিত্যিক সতীনাথ সম্পর্কে নির্মম আত্মবিশ্লেষণে সতীনাথ তৎপর ছিলেন। তার প্রমাণ এইসব উক্তিঃ মানুষকে সে ভালবাসত। তার কাজে প্রেরণা যোগাত তার আশাবাদী মন, তাঁর ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোটবেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসারধর্ম করার কথা তার মনের কোণায় উকিঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।... লিখতে তার ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখক যে সে কোনদিন হতে পারবে না তা সে জানে। কেননা খুঁটিনাটির উপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিসই যায় কলম এড়িয়ে। ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মত ক্ষমতা আর ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের উপর চেপে বসেছিল অসংখ্য খবরের বোঝা, যাকে সরল ভাষায় বলে সাহিত্য। (সত্যি ভ্রমণ কাহিনী, পৃঃ ১) সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর (১৯৩৯ - ৪৮)। তিনবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ব্যক্তিগতসত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছরের বন্দীজীবন হাজারিবাগ জেলে (১৯৪০), দ্বিতীয় ছ মাসের জন্য (১৯৪১), তৃতীয়বার বিয়াল্লিশের আন্দোলনে (১৯৯৪২) প্রথমে পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে, পরে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে। সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলে থাকার সময় (১৯৪৩-৪৪) 'জাগরী' উপন্যাস রচিত হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে জেনে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন (১৯৪৮), সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তাও ছাড়েন। সরে আসেন রাজনীতির পঙ্কিল ঘুর্ণাবর্ত থেকে।

জেলে বসেই তিনি তুলসীদাসের রামচরিত মানস পড়েন, চর্চা করেন হিন্দী, উর্দু ও ফরাসী ভাষার। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে যেসব মানুষকে দেখেছেন, তাদের অনেকেই 'জাগরী' উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছিল। সেই সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছিল তাঁর দেখা আগষ্ট আন্দোলনের শরিক বিহারের গ্রামীণ মানুষেরা। সদস্য ফেলে আসা উত্তেজনাময় আগষ্ট বিপ্লবের দিনগুলি ও উৎসাহী মানুষগুলি 'জাগরী'তে জায়গা পেয়েছে। বীরগাঁও ষ্টেশন, কৃষ্ণানন্দপুর স্টেশন, ধামাদাহা, হরদা হাটের সর্বপরিচিত দুবে - দুবেনী, মনিহারীঘাটে সোস্যালিষ্টদের সামার ট্রেনিং ক্যাম্প! সেখানে বিলু অধ্যক্ষ।

বিলুবাবুর মতো আমাদের দলে আর কেহ পড়াইতে পারে না... আমাদের দলের ইনটেলেকচুয়ালস - দের মধ্যে বিলুবাবুর স্থান খুব উচ্চে*), কারহা গোলার ধনীগৃহস্থ ধনপত যাদবের হাতী নিয়ে শিকার করা, রনয়ো গ্রামের বাদর - বারেগাসিয়ার মা'র াতে জল ঘাওয়া, কবৈয়া গ্রাম, রানয়োয় জমিদারদের গুলিচালনা এসবই সতীনাথের জীবনের ভগ্নাংশ।

ভাগলপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন সতীনাথ (১৯৪৪)। পূর্ণিয়ার শ্রদ্ধেয় দাদামশায় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশপত্র নিয়ে সতীনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য 'জাগরী'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতায় সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক (সজনীকান্ত দাস) ও প্রকাশকদের সঙ্গে দেখা করেন। অচেনা নূতন লেখকের উপন্যাস ছাপতে কেউ আগ্রহী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন বিপ্লবীদের দ্বারা চালিত সমবায় প্রেস থেকে 'জাগরী' মুদ্রিত হয় ও সমবায় পাবলিশার্স কর্তৃকপ্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের অশোবরে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়।

১৯৪৮ সালে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সতীনাথ পুরোপুরিভাবে সাহিত্য - চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'জাগরী' ছাপার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের রসিকসমাজ কতটা খুশি হয়ে উঠেছিলেন একদিন, কীভাবে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন সাহিত্যসংসার, তার বিবরণ আমরা জেনেছি। কিন্তু 'জাগরী'র সেই লেখককে আজ আমরা মনে রেখেছি কতটুকু? ১৩৫২ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস হিসেবে পরিচিত ছিল বইটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালে উপন্যাসটিকে প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। 'জাগরী'রাজনৈতিক উপন্যাস, কিন্তু নিছক আজনীতি সর্বস্ব উপন্যাস নয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এক রাত্রির কাহিনী 'জাগরী'। উপন্যাসের চারটি অংশে চারজনের স্বগত চিন্তা বাঙময় রূপ পেয়েছে। সোসালিষ্ট পার্টি আয়োজিত বিয়াল্লিশের সহিংস বিধ্বংসী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ফলে বৃটিশ শাসনের বিচারে প্রাণদণ্ডে বিলুর ফাঁসি হবে আগামী ভোরে। সে রয়েছে ফাঁসি সেলে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তার ছোটভাই নীলু। সে রয়েছে জেলের বাইরে জেলগেটে, ভোরে তার দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাবেবলে। একই কারাগারে 'আপার ডিভিশন ওয়ার্ড'এ রয়েছেন বিলু নীলুর বাবা মাষ্টারজী- নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী। আর মা রয়েছেন 'আওরৎ - কিতাকক্ষ য়। তিনি রাজনীতি করেন না। স্বামীর পদানুগামিনী। নিজের অথবা প্রিয়তম একটি প্রাণের আসন্ন অপঘাতের সামনে চারটি চরিত্র আত্মচিন্তায় মগ্ন।

এক প্রলয়ঙ্কর রাজনীতে একই জেলের চার জায়গায় - আপার ডিভিশন ওয়ার্ড, আওরৎ কিতাব ফিমেল ওয়ার্ড, ফাঁসি সেল, আর জেল গেটে যথাক্রমে বাবা, মা, বড় ছেলে ও ছোট ছেলে রজনী অবসানে একজনের ফাঁসির মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে, এর চেয়ে মর্মবিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে? 'মাষ্টার সাহেবের পরিবার, রাষ্ট্রীয় পরিবার বলে সবাই জানে। কিন্তু বাপ - মা দুই ছেলের পরস্পরের স্নেহ - ভালবাসা বাৎসল্যের প্রবল আকর্ষণ - বিকর্ষণের সংবাদ বাইরের লোকে জানে না। সেই অন্তরঙ্গ মধুর পারিবারিক স্নেহ সম্পর্কের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে। /আদর্শনিষ্ঠ প্রধান চরিত্রগুলির জীবনে চরম দুঃখ ও ব্যর্থতা ঘটিয়াছে। শুধু সংসারের কষ্ট, লাঞ্ছনা, পরাজয় নহে, মৃত্যুদন্ডও প্রিয়জনের আসন্ন মৃত্যু নহে, তাহার চেয়ে নিদারুণ ব্যাপার - পরমাত্মীয়ের ও প্রীতিভাজনের নিকট হইতে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আদর্শনিষ্ঠার শোচনীয় ব্যর্থতা ইহাদের জীবনে যেন একটা চূড়ান্ত গ্লানি ও ব্যর্থতার কালিমা আনিয়া দিয়াছে।* (শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় - 'জাগরী')।

উপন্যাসের শেষে বিলুর ফাঁসি হয় না। তাদের ফ্যাসি স্থগিত হয়ে গেছে অনিশ্চিত, কালের জন্য। জেল - গেটে দাঁড়িয়ে, সে-সংবাদ শুনে নীলুর মনে হয় /পাথরের জেল-গেটের উপরতলায় হঠাৎ ঊষার আরক্তিম আলোর মধুর ঝলক লাগে। এভাবেই মধ্যবিত্ত মনের সংস্কার - সিদ্ধ পরিবারিক স্নেহবন্ধনের জয় ঘোষিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

পরিবেশের বাস্তবতা উপন্যাসটিতে দিয়েছে বিশ্বাস্যতা। লেখকের নিজস্ব রাজনৈতিক জীবন ও কারাজীবনের সব অভিজ্ঞতা এখানে নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খতার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের নানা ছবি এখানে ধরা দিয়েছে। ১৯৪২ -এর আগষ্টের ঘটনাসমূহের সে বর্ণনা নীলু চরিত্রের মাধ্যমে বিবৃত, তা সতীনাথেরই ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা। সেন্ট্রাল জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ছবি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। মাষ্টার সাহেবের চরকার ঘরঘর, কয়েদীদের 'যারিয়া বাজানোর শব্দ, উন্মত্ত জনতার 'হেঁইয়ো জোয়ান' চীৎকার, টমিগানের ফটফট, সব মিলে এক জটিল সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। আর মনের সুখে ভেসে আসছে এক দূরশ্রুত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি - 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'।

জেলের ওয়ার্ডের ভিতরে ভেসে আসে বাহিরের পৃথিবীর কত শব্দঃ রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ শোনা যায় বেলা তিনটায় ওরাত সাড়ে বারটায়। সকাল পাঁচটায় আর বিকাল সাড়ে ছয়টায় শোনা যায় স্টিমারের ভেঁপু। শোনা যায় তখন এরোপ্লেনের শব্দ। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে শোনা যায় প্রহরী ও ওয়ার্ডারদের চীৎকার - 'সতরহ্, অধারহ্, ঊনিশ নম্বর। বাজখাঁই স্বরের আওয়াজ শোনা যায় - বোলোরে অস্পতাল।' রাজনৈতিক বন্দীদের হল্লা, থালা ও গেলাস বাজানোর শব্দ, চীৎকার। আর তা ছাপিয়ে ওঠে 'পাগলী' ঘন্টা (অ্যালার্ম' ঢং ঢং ঢং আর ওয়ার্ডারের হুইসল- পিঁ পিঁ পিঁ। 'মিলিটারী আ রহী হ্যায়।' দলবদ্ধ মার্চের শব্দ, গেট খোলার শব্দ, লাঠি চার্জের শব্দ, আহত বন্দীদের কাতরানির শব্দ, আমাদের পরিচিত জগতের বাইরে আর এক জগৎ, তা বাস্তব, প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, বলতেহয়, পরিবেশের বাস্তবতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মানবচরিত্র ও ইতিহাসের ঘটনাবর্ত। মানুষের নানা সাংসারিক ব্যক্তির পিছনে যে মানব আত্মাটি আছে তারই রূপ ও রস তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। জেলের জীবন ও বাহিরের দেহাত জীবন, আশ্রমের জীবন ও ওয়ার্ডের বন্দীজীবন বিস্ময়করভাবে মানবতার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯)। উপন্যাসটি 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। কিন্তু পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে 'মাসিক বসুমতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির সূচনা ও উপসংহার রীতিমতো নাটকীয়। শুরু, হয়েছে এভাবে ঃ তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরি ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত। সেটি মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে - এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। ... মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুল নাচের সুতোটা তাঁর হাতে। ... লোকে ভুল ভাবছে যে তাঁর দেখানো পুতুল নাচের উপকরণ -রক্ত মাংসে গড়া সুখ দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনী গড়ে তুলছে? বুঝছে না এ চাকা ঘোরাচ্ছেনচিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করে কারিগর; আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি।

এই চিত্রগুপ্ত কি হিন্দু বিশ্বাস মতো পরলোকে যমরাজের দপ্তরের সচিব? পাঠকেরা দ্বিধায় পড়েন। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে দেখা যায় চিত্রগুপ্তের উদ্ভাসিত মুখ। তখনই জানা যায় যে এই 'চিত্রগুপ্ত' আসলে একজনের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনায় পয়সা নেই। সেইজন্য লেটারহেড ছাপিয়ে একটা নূতন ব্যবসা খুলে বসেছেন, - ডাকযোগে গল্প লেখানো শেখানো। নূতন লেখকদের লেখা দোষ ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, আর তাঁর বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে পনেরোটি মন্ত্রপাঠে পুরোদস্তুর লেখক তৈরি করে দেওয়া - 'ইহাই চিত্রগুপ্ত - বাসী - প্রতিষ্ঠান' এর উদ্দেশ্য। বোঝা যায়, মূল, উপন্যাসের পরিণামী ট্রাজেডি-কে বিদ্রুপের ছটায় ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক। 'বিশেষ গোপনীয়' চিহ্নিত অংশে চিত্রগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য কী কী দরকার (ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গল্পের ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন (খ) খানিকটা রাজনীতি (থিকো গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়। (গ) সাধারণ বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমানে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না। (ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।

এখানে সতীনাথের স্ফভাবসুলভ পারিহাসরসিক মননদৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠে। যে শ্রদ্ধেয় মনস্বী সাহিত্যিক গোপাল হালদারের ভাষায়ঃ সব্যঙ্গ হাস্যে সতীনাথ দেখিয়েছেন কথাশিল্পের কারসাজি। একটা পরিকল্পিত ছকে কয়েকটা নির্দিষ্ট খণ্ড জুড়ে দেওয়াই তাঁর আর্ট। যে কাহিনী ভাবাবেগ স্পর্শ করেছে, সতীনাথ দুষ্টুমি করেই সহাস্যে তা debunk করেছিলেন। (সতীনাথ ভাদুড়ী - সাহিত্ন ও সাধনা)

এ উপন্যাসের পটভূমি বিহার - পূর্ণিয়া জেলার বলীরামপুর ও শিরনিয়া। উপন্যাসের নায়ক অভিমন্যুর চিতাদৃশ্য দিয়ে আরম্ভ হয় ঘটনা। তারপর ফ্ল্যাশব্যাক্ করে তা ফিরে যায় অতীতে। আর উপন্যাসের মূল কাহিনীর পরিসমাপ্তি এর নায়িকা মিনাকুমারীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার ঘটনায়। এই দুটি ব্যক্তি - মৃত্যুর ঘটনার মাঝখানে মূলত বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক - মালিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের নানা টুকরো বৃত্তান্ত জুড়ে থাকে উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের পরিবেশের বাস্তবতা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁর বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকেই সতীনাথ এই উপন্যাসের উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন। মিল মজুরদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতাও সতীনাথের ছিল।

সতীনাথ গবেষক ডঃ মৈত্রেয়ী ঘোষ জানিয়েছেন (সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায় গ্রন্থে) ঃ চিত্রগুপ্তের উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন মানুষ না স্পষ্ট জানে নিজের মনকে, না জানে অপরের মনকে। মানুষ না বোঝে নিজেকে, না বোঝে পরকে। মানুষ না পারে মনের সবকথা দুনিয়াকে জানাতে। না পারে সব জানতে 'The feeling of not being understood and of not understanding the world' - ডায়েরিতে লেখা সতীনাথের এই মন্তব্য এখানে প্রমাণিত। মানবসম্পর্কের জটিল অন্তর্লোকের রহস্যই লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর অম্বিষ্টতা চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসে প্রমাণিত। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' সতীনাথের তৃতীয় উপন্যাস। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে (জুন ১৯৫০)। সতীনাথের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তাঁর সামাজিক পর্যবেক্ষণ, কারাকক্ষে রামচরিতমানস পাঠ, গ্রামে গ্রামে নীচের তলাদের সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ, সর্বোপরিনিজেকে বিযুক্ত করে বস্তু ও সত্যকে এক বাস্তব জীবনব্যাপী অন্বেষা, নিজেকে চেনা ও খুঁজে সেরাকে দেখা এই বিপুল গ্রন্থের উপাদান। সতীনাথ নিজে মনে করেছিলেন যে 'জাগরী' নয়, চোঁড়াইচরিত মানস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। নায়কের নাম ঢোঁড়াই। এর ঘটনাভূমি আমাদের চির পরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার, এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি, এর জগৎটা গড়ে উঠেছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর তাৎমাদের নিয়ে, আর এই সংগঠনের মধ্যে লেখক আমাদের ফিরিয়ে নিয়েছেন আপাত প্রাচীন যুগে, আদিকাণ্ড বাল্যকাণ্ড রামিয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে কোন তুলসীদাসী রামায়নের স্বাদে। অথচ পূর্বগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না করেও এ-বই আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে, পরিচিত দেশশ্রী থেকে ছিন্ন না করেও এ-বই-আমাদের এক নতুন দেশের মুখোমুখি নিয়ে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীঃ নিঃসঙ্গ দীক্ষা - সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২য়খণ্ড, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত। সম্পাদকদ্বয় আরো লিখেছেন - 'তিনি লেখকের লেখক, পাঠকের লেখক নয়, এই ভেবে একদিন তাঁকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি।'

উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ঢোঁড়াই জিরানিয়ার শহরতলি তাৎমাটুলির এক অনাথ বালক। এই ঢোঁড়াইকে সতীনাথগড়ে তুলেছিলেন বাস্তবে দেখা একটি চরিত্রর সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে। তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, 'ঢোঁড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঁঢ়াই, উচ্চারণ ঢোড়াহাই। বাঙালীর নিজেদের ধরণের করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। ('ঢোড়াই' প্রবন্ধ - সতীনাথ) জিরোনিয়া তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলি এবং বিসকান্ধার কোয়েরীটোলার সংহত, গোষ্ঠীবদ্ধ, জন সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ আছে দীর্ঘ উপন্যাস জুড়ে। তাঁর সমগ্র উপন্যাসটিকে গড়ে তোলা হয়েছে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এর ছাঁচে ফেলে।

ঢোঁড়াই যে তাতমাটুলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই হৃদয়হীন, অমোঘ। সেই অমোঘ নির্মম নিয়মের আগড় ভেঙে কীভাবে ঢোঁড়াই বেরিয়ে আসছে তারই হৃদয়হীন কাহিনী 'ঢোঁড়াই চরিতমানস।' লেখকের স্বীকারোক্তি ঃ 'তাতমাটুলি, ধাঙড়টুলি ছোটবেলা থেকে আমার মনে অজানা স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলেছে ও নিয়ে না লিখে আমার উপায় ছিল না'। (লেখকের ডায়েরি ১-৪ জানুয়ারি ১৯৬০)।

ঢোঁড়াই চরিতমানস উপন্যাসের পরবর্তী উপন্যাসত্রয়ী 'অচিনরাগিনী' (১৯৫৪), 'সংকট' (১৯৫৭) ও দিগ্‌ভ্রান্ত (১৯৬৬)লেখকের শিল্পপ্রয়াসকে এক সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে। অচিনরাগিনীর সূচনায় লেখক জানিয়েছেনঃ 'পিলে আর তুলসী দুইবন্ধু। নতুন দিদিমার সঙ্গে তাদের শোনিত সম্পর্ক নেই। পাড়ার বধূ, বাংলাদেশ থেকে বিহারে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর সংসারে এসেছেন। এএক অভিনব স্নেহ - সম্পর্ক। পাতানো নতুন দিদিমার সঙ্গে দুটি কিশোরের মান অভিমান ভালবাসার টানাপোড়েনের কাহিনী। বাইরেরজগৎ নয়, অন্তর জগতের

কাহিনী, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মোচড়, অনুপুঙ্খ বর্ণনা। হৃদয়ের চোরাগলিতে আনাগোনা। নতুন দিদিমা দুজনকেই ভালবাসেন, তবে কাহিনীর কথক পিলে স্বীকার করেছে - নতুন দিদিমা তার চেয়ে তুলসীকেই বেশি ভালবাসেন পিলে এ কাহিনীর কথক, আবার সেই বিশ্লেষক। কেবল নিজের নয়, পরেরও। কনফেশন-এ তার কুণ্ঠা নেই। পিলে, তুলসী আর নতুন দিদিমা। তিনজনের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন আর কম্যুনিকেশনের জট গড়ে তোলে এক অভিনব আলো - আঁধারি মনোলোক। মানব সম্পর্কের জটিল অন্তর্লোকের যে রহস্য ঔপন্যাসিক সতীনাথের অন্বিষ্ট, 'অচিনরাগিনী' উপন্যাসে তারই রূপায়ন।

সতীনাথের পঞ্চম উপন্যাস 'সংকট' (১৯৫৭)। এই উপন্যাসে বাইরের জগৎ ছেড়ে অন্তর্লোকে অন্বেষণই মুখ্য, এখানে ত্র বিশ্বাসজী চরিত্র অবলম্বনে রূপায়িত। বিশ্বাসজীই কথক। বিশ্বাসজীর নাম যুক্তিনাথ বিশ্বাস। লেখক সতীনাথের জীবনের বেশ কিছুঘটনার সঙ্গে বিশ্বাসজীর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির মিল আছে। জনসেবা, রাজনীতিক চর্চা, সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে অংশীদার হওয়া, ফুলগাছ - পরিচর্যা, পাখি দেখা, বইপড়া, হঠাৎ জনসেবা ও রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া এইসব ঘটনার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের মিল আছে। উপন্যাস হয়ে উঠেছে লেখকের আত্মানুসন্ধানের বাহন।

উপন্যাসের শেষে লেখক শেষবাক্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্তর্হিত বিশ্বাসজীর বাড়িতে লাইব্রেরী হবে তাঁর নামে। অর্থাৎ জ্ঞান ও যুক্তির চর্চা হবে। সারাজীবন যার চর্চা করে হেরে গেলেন বিশ্বাসজী, তারই চর্চা হবে।

এই উপন্যাস আধুনিক মানুষের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। এক অর্থে নায়কের অন্বেষণ লেখকের আত্ম - অন্বেষণ। 'সংকট' উপন্যাস সে-অর্থে সর্বাঙ্গীন আধুনিক উপন্যাস।

সতীনাথের মানবমনের জটিল অন্তর্লোকে অন্বেষণের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শেষ গ্রন্থ 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে (১৯৬৬)।এটি গ্রন্থাকারে লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস রচনার জন্য লেখক উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। ব্যাপক অধ্যয়নে আয়ত্ত করেছিলেন বৈষ্ণব সমাজ ও তত্ত্বের পরিচয় গোপাল হালদারও (সতীনাথ ভাদুড়ীঃ সাহিত্য ও সাধনা-জানিয়েছেন, -'একবার বৃন্দাবনে গিয়ে এক বৈষ্ণব আশ্রমে কিছুকাল বাস করেছিলেন, তাঁর শেষ উপন্যাস দিগ্‌ভ্রান্তের উপকরণ ও বস্তুসত্যকে তখন আয়ত্ত করেন।' ধর্মজীবনকে উপন্যাসে শিল্পায়িত করার জন্য ঔপন্যাসিকের বৈষ্ণব আশ্রমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তজনক। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতার কাহিনী। বিষাদ ও নৈরাশ্য থেকে সঙ্গপ্রাপ্তি ও আশায় প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। সুবোধ ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী অতসীবালা, দুই ছেলে মেয়ে মণি ও সুশীলের কাহিনী। বাইরের জীবনের নয়, অন্তরমহলের কাহিনী। কীভাবে তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, কীভাবে চারজনের মাঝে দেওয়াল গড়ে উঠেছে তার কাহিনী। সেই দেয়াল দুরতিক্রম্য বলে মনে হয়েছে। আবার চারজন কীভাবে সেই ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভেঙে কাছাকাছি এসে গেছেন, তারই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ 'দিগ্‌ভ্রান্ত'। যজ্ঞডুমুর গাছটা কাটার উদ্যোগপর্ব দিয়ে উপন্যাস আরম্ভ, আর শেষ হয়েছে মামাবাবু অর্থাৎ হরিদাস যজ্ঞডুমুর ডালে ঝুলছে। এই গাছকাটা আর গাছটিকে আত্মহননের জন্য নির্বাচন করার মধ্যে লেখক একটি প্রতীকের ইঙ্গিত রেখেছেন, ডঃ মৈত্রেয়ী ঘোষের মতে (সতীনাথ ভাদুড়ীঃ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়) 'সময় ও স্মৃতি অনুষঙ্গে গড়ে ওঠা বিচিত্র মনোলোকের অনেক অন্ধকার গলিপথে ভ্রমণ করে আবিষ্কার করেছেন মানবিকসম্পর্কের জটিল রহস্যকে, উন্মোচন করেছেন মানবসম্পর্কের জটিলতাকে। মানুষ কত নিঃসঙ্গ, কত একলা, কত স্বতন্ত্র তা তিনি দেখিয়েছেন। একজন আর জনকে ঠিকই বুঝছে কিন্তু কম্যুনিকেট করতে পারছে না। এইরকম ভুল বোঝাবুঝি মুচড়ে দেয় তাদের হৃদয়কে। এই কম্যুনিকেশনের জট কীভাবে ত্রস্ত করে জীবনকে, কীভাবে এক একজন মানুষকে তা করে দেয় নিঃসঙ্গ, নিষ্প্রভ, ছন্নছাড়া। সেইটিকে ধরাই সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রধান আকর্ষণ। তাঁর ছ'টি উপন্যাসে -জাগরী থেকে দিগভ্রান্ত-এ চলেছে এই আকর্ষণ। সতীনাথ এই আকর্ষণের রূপকার। এর দ্বারাই তিনি ছুঁয়েছেন মানবমনকে ও মানুবসম্পর্কের জটিলতাকে।

সতীনাথ সারাজীবনে মাত্র ৬২টি ছোটগল্প লিখেছেন। কোনো সামাজিক সংকট নয়, তাঁর গল্পের উপজীব্য বিচিত্র মানুষেরজীবন, তাদের বিটিত্র মানসিক জটিলতা আর টানাপোড়েনের কাহিনী। এর মূলে রয়েছে একদিকে ব্যবহারজীবী, সৎ রাজনৈতিক কর্মী সতীনাথের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা। অপরদিকে নিরাসক্ত শিল্পীর জীবনদৃষ্টি। বহমান জীবনের নানা টুকরো টুকরো ছবি, হাসি অশ্রু অভিমান, অসঙ্গতি অসামঞ্জস্যর গড়ন পেটনে আশ্চর্যদীপ্ত সব অবিস্মরনীয় গল্প। শুরু করেছেন ২৫ বছর বয়সে 'জামাইবাবু' নামে একটি অসাধারণ গল্প দিয়ে যা প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩১ সালে)। তিনি ছিলেন যথেষ্ট পরিমানের সমাজসচেতন ও রাজনীতিসচেতন বাস্তব অভিজ্ঞ এক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার। তৎকালীন ও সমকালীন ইতিহাস - সমাজ-রাজনীতির পাঠের জন্য তাঁর কিছু অসাধারণ ছোটগল্প যথা-গণনায়ক, বন্যা, আল্টা বাংলা, আন্তর্জাতিক চরনদাস এম. এল. এ. একটি কিংবদন্তীর গল্প, জলভ্রমি প্রভৃতি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে সতীনাথের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর শ্লেষ বিদ্রুপ ব্যঙ্গপ্রবণতা। দেশভাগের পটভূমিতে 'গণনায়ক' এর মতো গল্প, সতীনাথের অন্তর্দৃষ্টি সেই গল্পকে শিল্পসার্থক করে তোলে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্মম বিদ্রুপে বিদ্ধ করেন তাঁদের, এসব গল্প তাই কৌতুকের পাশাপাশি বেদনারও। দেশভাগ, কালোবাজারি এবং হিন্দু- মুসলমানদের চরিত্র নিয়ে এই গল্পের পটভূমি। পূর্ণিয়াতোলার অন্তর্গত গোপালপুর থানার অধীনে আরুয়াখোয়া নামে বিখ্যাত একটি হাট আছে। কালোবাজারি এবং চোরাইকারবারের জন্য এই হাট বিখ্যাত। এই হাটে চাল, ডাল, চিনির ব্যবসা করতে আসে মুনিমজী, সে রাজস্থান থেকে পূর্ণিয়ায় ব্যবসা করতে এসেছে। এই মুনিমজী এবং হাটের মুসলমান ইজারাদার, দুজনেই কালোবাজারি এবং চারাই কারবারে আগাপাছতলা জড়িয়ে আছে। ছোটগল্পটি লেখা হয়েছিল ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালের কয়েক মাস আগে। তখনও ঘোষণাহয়নি পূর্ণিয়া জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চল এবং দিনাজপুর জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চল হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তানে পড়বে। এই নিয়ে জল্পনা - কল্পনা, রটনা - রটিয়ে গুজব চলেছে। ব্যবসার সুবিধার জন্য এইসব গুজবের ইন্ধন যোগাচ্ছে মুনিমজী। গুজব রচিয়ে তিনি হিন্দুস্থানি পতাকা ও পাকিস্তানি পতাকা বিক্রি করেন। হরিপুর পাকিস্তান হবার কথা নয়, সেই হরিপুর আধিবাসীদের তিনি বিক্রি করেনহিন্দুস্তানী পতাকা। শ্রীপুর হিন্দুস্তান হবার নয়, সেই শ্রীপুর অধিবাসীদেরকে পাকিস্তানি পতাকা বিক্রি করেন। পরে কমিশনারের দেশভাগের রায়ে দেখা গেল, ঘটনাটি বিপরীত হয়েছে। হরিপুর গেছে পাকিস্তানে, শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্তানে। এরপর মুনিমজী আরো একটি গুজব ছড়িয়ে দেন, সকলে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিয়ে দেবো এভাবে হিন্দুস্থানী ও পাকিস্তানী ফ্লাগ গুলো আবার মুনিমজির কাছে ফিরে আসে। এই নিশানগুলো দু'দুবার করে বেচেন মুনিমজী। আর তখনি মুনিমজীর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

সতীনাথের গল্পসংকলন 'গণনায়ক' এর আরও উল্লেখযোগ্য গল্প - বন্যা, আল্টাবাংলা, পঙ্কতিলক প্রভৃতি। 'বন্যা' গল্পে আছে কুশী নদীর বানের জলে ভেসে যাওয়া পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত হরিপুরা গ্রামের বানভাসী বিহারী আদিবাসীদের নিয়ে বাস্তব কাহিনী। বিপদে - আপদে সব শ্রেণীর মানুষ জাত-বেজাত গরিব বড়লোক, নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ, হিন্দু - মুসলমান, সবশ্রেণীর মানুষের পাশে দাঁড়ায়। মানবিকতা ও সহযোগিতার হাত বাড়ায়। হয়ে যায় সবাই একজাতি - একপ্রাণ, সেই জাতির নাম মানুষ জাতি। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্নতা-মারামারি - হাতাহাতি ভুলে যায়। বিপদ কেটে গেলে আবার মানুষ, সবশ্রেণীর মানুষ স্বধর্মে ফিরে আসে। ফিরে আসে হিংসা বিদ্বেষের জগতে, ফিরে আসে জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা-দাঙ্গামায়। তখন আবার স্ব-স্ব শ্রেণীতে অবস্থানকরে। এভাবেই গল্পকার এই অসাধারণ ছোটগল্পটিতে জীবনের দুটি স্বরূপ তুলে ধরেছেন, বন্যার সময় এবং বন্যার জল সরে যাওয়ার পরের সময়, 'আল্টাবাংলা' গল্পে শুরুতে গল্পকার বলেছেনঃ 'মানুষদের কথাই বলি, কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালো শিরার দাগ'। এই নির্মমতা, নির্মমতাই রয়ে গেছে একজন ভাল মানুষটাকে মেরে ফেলছে, আমরা, বর্ণাঢ্য অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দর্শক হয়ে দেখছি। ঠিক সেরকমই আল্টা বাংলার (প্ল্যান্টার্স ক্লাব) সেক্রেটারি বেঞ্জামিন সাহেব রোববারে কাজে আসেনি বলে বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রী বিরসা ওঁরা ওকে দুহাতে মাথায় ইট চাপিয়ে গ্রীষ্মের রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বিকেলে মাটিতে পড়ে যায়, পরে অজ্ঞান হয়ে মারা যায় সে নীরবে, নিঃশব্দে পুরুষানুক্রমে শোষিত দলের আঠিয়াদের নীরব আর্তির আলেখ্যও।

৫টি অনান্য গল্পগ্রন্থ হল 'অপরিচিত' (১৯৫৪), 'চকাচকী' (১৯৫৬), 'পত্রলেখার বাবা (১৯৫৯), 'জলভ্রমি' (১৯৬২) ও 'অলোকদৃষ্টি' (১৯৬৩)।

'অপরিচিতা' গল্পগ্রন্থের 'ভূত' গল্পে সুরজকুঁয়রীকে মুসলমান ভূতে পেয়েছে, মাঝে মাঝেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়, হাতে পায়ে খিঁচুনি, চোখ কপালে, শরীর শক্ত। বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে যায ঠোঁট নীল, আতঙ্কে আছাড়ি পিছাড়ি করে। ভূত ছাড়াবার জন্য ওঝা আসে। কানোয়া মুসহর, রুস্তম রোজা, হরিশ কম্পাউন্ডার, অবশেষে নিবারণ ডাক্তার এসে বুদ্ধি দেন - মেয়ের বিয়ে দাও। গজাধরের সঙ্গে বিয়ের পর সুরককুঁয়রী সুস্থ হয়ে ওঠে। গজাধরের সঙ্গলিপ্সা তাকে পেয়ে বসে। গজাধর না থাকলেই আতঙ্ক হয়, ঐ বোধহয় সেই মুসলমান ভূতটা তাকে পেয়ে বসে, বিরৌলীবাজারে চিত্রগুপ্তের পূজায় মেলা বসে। সুরজকুঁয়রী দেখতে যায় তার ননদ রেশমীর সঙ্গে। গিয়ে দেখে মেলায় 'সমর' পালা অভিনয় হচ্ছে। থিয়েটারের মঞ্চ এক চরিত্র রফিককে দেখে সুরজকুঁয়রী ভয় পায়। ঠিক যেন মুসলমান ভূত মঞ্চে, তাকে দেখেই সে ভিরমি খায়। বাড়ি ফিরে টের পায় তার স্বামী গজাধর -ই সেই রফিক, তারই সামনে সে 'মেকাপ' মুছে ফেলে। সুরজকুঁয়রীর ভয় কেটে যায়। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। আজ সে ভূতের ভয় থেকে মুক্ত। 'চকাচকী' গল্পগ্রন্থের 'চকাচকী' আসলে ধামদাহা হাটের দুবে- দুবেনীর আতিথ্য স্বীকার করতে হত। দুবের মৃত্যুশয্যায় দুবেনী কথকের কাছে ফাঁশ করে দেয় তাদের জীবনের গোপন কথা, দুবেনী জানায়, একজন কাউকে সে কথা বলতেই হবে। চল্লিশ বছর ধরে চেপে থাকা কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। তবু রামজী ক্ষমা করেনি আমাদের। আমি দুবেজীর নিকট - আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও

আপনার লোক। নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে তা কি হয়? মুখে আগুনটুকুও পাবে না? তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে পার নিয়ে এস বাড়ি থেকে।

দুবেনীর কাতর অনুরোধে কথককে যেতেই হয় দুবের বাড়ী। নিয়ে আসে দুবেনীর অনিচ্ছুক ছেলেকে সৎকারের জন্য, বাপের মুখে আগুন দেবার জন্য। ফিরে এসে শোনেন, দুবেনী পলাতাক। দুবেজীর সৎকার হয় ছোট নদীর ধারে শ্মশানে। দুবেজীর শেষ কৃত্যের, স্বর্গলোকের জন্য দুবেনী চল্লিশ বছরের ভালবাসার দাবি সরিয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তবু সমাজ অস্বীকৃত সেই ভালবাসার টানে রাতের নদীর ওপারে কাশবনে লুকিয়ে দেখেছে, দুবের শেষকৃত্য। 'দুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় দুবেনীর বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে দুবের একলার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে। দুবেনীর এই অসাধারণ আত্মবিলোপের মর্যাদা দিলেন এ জগতে দুজন- লেখক আর মুসাফিরলাল।

গল্প সংকলন 'পত্রলেখার বাবা'য় লেখক নানা বিচিত্র পটভূমি ব্যবহার করেছেন। অলৌকিক, নারকীয়, অতিসূক্ষ্ম গূঢ় অস্বাভাবিক বক্রগতি মনোবিকার। এই সব ক্ষেত্রে তাঁর গল্প রচনার সামর্থ্য পরীক্ষা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। 'পত্রলেখার বাবা' গল্পের বিন্যাস - চাতুর্য অভিনব, পরছিদ্রান্বেষী দোলগোবিন্দ বাবা বেনামা চিঠি ছেড়ে উদ্দিষ্টের উপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আনন্দপান, শেষে তারই মেয়ের গোপন প্রেমপত্র মেয়ের বই থেকে পেয়ে হতবাক হলেন, তখন নিজের স্ত্রীকেই বেনামা পত্র লিখতে বসলেন। দোলগোবিন্দ স্ত্রীর কাছে প্রথম যে চিঠি লেখেন দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের পরে, সে চিঠির ভাষায় রোমান্সের বদলে যে অ্যান্টি - রোমান্স, তাকে সতীনাথ আশ্চর্য ভাবে ধরে দেন অ্যান্টিন্যারেশনে।

'জলভ্রমি' গল্পসংকলনের গল্পগুলিতে লেখক আরো অন্তর্মুখী, সূক্ষ্মতর স্বাধীনতা, উত্তর ভারতীয় সমাজের নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বহীনতা ও অর্থলিপ্সু সরকারী অব্যবস্থা, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা প্রভৃতি কিছু গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে। যেমন চরণদাস এম. এল. এ. গল্পে স্বাধীন দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে গল্পকার নির্মম স্যাটায়ার করেছেন। ক্ষমতা এম. এল. এ. কে কী দিয়েছে, আর কী কেড়ে নিয়েছে, গল্পকার এখানে তার নিরাসক্ত দ্রষ্টা। 'চরনদাস' নামটিই এখানে তীব্র বিদ্রুপের লক্ষ্য, 'মা বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম - চরণদাস। একসময় লোকে ভালবেসে ডাকত 'চরণদাসজী' বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারি দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণদাস এম. এল. এ., সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজি জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়ে মিয়ে লিয়ে সাহাব বলে; আর যাদের ইংরাজি জানবার কোনরকম দাবি নেই তারা ডাকে - মায়লে - জীবলে। এই উচ্চারণ বিকৃতি কোনরকম দুরভিসন্ধিজাত নয়। সাধারণ মানুষ তথা ভোটারদের দৃষ্টিকোণ থেকে চরণদাসের মতো নেতাদের ছবি এঁকেছেন গল্পকার।

আমাদের জীবনের চারপাশে জগতের যা কিছু অশুভ অসত্য বিকৃত, তাকে তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে বার বার আঘাত করেছেন সতীনাথ। হাসি - কৌতুকের অস্ত্র দিয়েই আক্রমণ করেছেন যাবতীয় দুর্নীতিকে। এরকমই একটি গল্প 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ'। এই প্রতিষ্ঠানটি করদাতাদের, কিন্তু আইন বাঁচিয়ে প্রদেয় কর কে কত এড়িয়ে যেতে পারে এই নিয়ে চরিত্রদের মধ্যে চলে প্রবল প্রতিযোগিতা। মুনশী নকছেদীলাল, মৌলবী ডাক্তার আলি, দারোগা মাহাতো, বাঙ্গালী মাহাতো, অনামী বাত, পন্টন চৌধুরী, রসিকলালমন্ডল, রামখড়ম সিং, এঁদের নাম, বক্তৃতা, কর্মকান্ড আমাদের হাসির খোরাক যোগায়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপটি আমূল বিদ্ধ করে।

'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ' গল্পের নামাঙ্কিত সংঘে ধ্বজা উড়িয়ে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ-মূলক কাজে অর্থ সংগ্রহ করে বিদেশে সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন পাঠিয়ে, এমনকি বন্যাত্রাণেও চাঁদা সংগ্রহে তাদের উদ্যোগ ত্রুটিহীন, শুধু দেখা যায় - গ্রামাঞ্চল থেকে মন্ত্রীর হাতে টাকা আসতে সময় লাগে একবছর চারমাস। বন্যাবিপর্যস্ত অসহায় মানুষগুলোকে উপবাসী রেখে মহাসমারোহে যে ত্রানযজ্ঞ উদ্‌যাপিত হয়, এ তারই করুণ ছবি - সাহায্যের মুক্তমঞ্চে চলে হৃদয়হীন প্রহসন।

'সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ যেমন দেখেছি' স্মৃতিকথায় (দেশ, ১৮ এপ্রিল, ১৯৬৫) এ প্রসঙ্গে বিমল করের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য - 'চরিত্রগুলি যেন কোনো আশ্চর্য স্পর্শে আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করার মতন শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। দুঃখবেদনা, ব্যর্থতা, প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্কে নানাবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি লেখা; অথচ একালের অধিকাংশ লেখকের মতন এইসব গল্পে অকারণচাকচিক্য, প্রগল্‌ভতা ও তৃতীয় শ্রেণীর নাটকীয়তা নেই।'

সতীনাথ প্রসঙ্গে -ডঃ মৈত্রেয়ী ঘোষ লিখেছেন - 'উপন্যাসে সতীনাথ মনোগহনের জটিল রহস্য উন্মোচনে যে সহায়তা পেয়েছেন তার বাইরে আর এক বিচিত্র জগতের দুয়ার তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে, সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা আরো বিচিত্র, অন্তর্মুখী পর্যবেক্ষণ আরো সূক্ষ্মচারী, জীবনের স্বাদ আরো সমৃদ্ধ। সেই সমৃদ্ধতর জগতের শিল্পী ছোটগল্প লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীকেআমরা ভুলতে পারি না।'

উপন্যাস, গল্প ছড়া সতীনাথের একটি অসাধারণ ভ্রমণকাহিনী আছে ('সত্যি ভ্রমণকাহিণী')। ভ্রমণকাহিনীটি অনেকটা তাঁরআত্মকথা। কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য দুদিক থেকে আমাদের স্পর্শ করে। এক, পরাধীনতার ঠিক পরে একজন সজাগ, বুদ্ধিমান ভারতীয় লেখকের প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ। দ্বিতীয়, ব্যক্তির সতীনাথের অনেক মতামত, ভালোলাগা মন্দলাগার খোলাখুলি আলোচনা এখানে পাওয়া যায়। এই প্রথম সতীনাথের একান্ত একটি ব্যক্তিগত নিভৃত দিকের পরিচয় আমরা পেলাম - অ্যানি নামে এক ফরাসি পরিচারিকা সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক। ফরাসি মন, ফরাসি সংস্কৃতি, ফরাসিভাষা, দেশাচার, লোকচার, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা সম্বন্ধে আগ্রহ সজীবহয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ অন্নদাশংকরের মতো সতীনাথের ইউরোপ ভ্রমণ যতটা বহির্ভ্রমণ, ততটাই অন্তর্ভ্রমণ।

'সত্যিভ্রমণ কাহিনী' (প্রকাশ্য ১৯৫১র সেপ্টেম্বরে) লেখকের অন্তরঙ্গ রচনা। অনেকটা ফরাসি জার্নাল ধরনে লেখা এই স্বাদু রচনা পদে পদে পাঠককে মুগ্ধ করে।

কাহিনীটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এক দীর্ঘ পত্রে (২১ জুন, ১৯৫১) লেখককে জানিয়েছিলেন... 'আপনি দেখবার চোখ নিয়ে গিয়েছেন, ভাষাজ্ঞান ইতিহাসজ্ঞান নিয়ে গিয়েছেন। একটা সমগ্র বিদেশী সভ্যতারএকরকম খুঁটিয়ে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বাঙলায় আর দেখিনি। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' একটি অসাধারণ সংযোজন রূপেই বিবেচিত হবে। এই বই একাধারে লেখকের নির্মম আত্মবিশ্লেষণ, পরিণত অভিজ্ঞতার ফসল, নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ফল, মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি পরিচায়ক একটা সমগ্র বিদেশী সভ্যতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, লাজুক, গভীর, সংবেদনশীল, নম্র ভদ্র উৎসুক, আত্মপ্রচারে অনিচ্ছুক, রসিক ব্যক্তিচরিত্রের উন্মোচকরূপে এই স্বাদু রচনা গৃহীত হতে পারে। তাছাড়া সতীনাথের অন্তরঙ্গ গোপন কথার একঝলক পরিচয়ও এই রচনায় পাই। .... নানা দিক দিয়ে এ বই স্বাদু। অদ্ভুত সমীক্ষাশক্তির সঙ্গে অপূর্ব দরদের সংমিশ্রণে এই রচনা হয়ে উঠেছে এমন স্বাদু যা সাহিত্য সংসারে দুর্লভ'।

নির্মম আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। কেন তিনি ফরাসি দেশে গেলেন? এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, ছোটবেলা থেকে ফ্রান্স সম্পর্কে মোহ জন্মেছিল, ধারণা ছিল 'ফরাসী মনটা কবির।' ফরাসিভাষা শিখেছেন, ফরাসি সংস্কৃতি আর ইতিহাসের উপর প্রচুর বই পড়ে নিজেকে অনেক দিন ধরেই তৈরি করে নিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসঙ্গ পাঠকের অনাদৃত সতীনাথ গোপনে একটা অবসর পেয়েছিলেন নিজেকে আরো বেশী করে তৈরী করে নেবার জন্য। অনেক লেখকের তুলনায় অভিজ্ঞতার অনেক বড়ো বিত্ত নিয়েই তিনি সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম বইয়ের সফলতার পরেও তাঁর মনে হয়েছিল দীক্ষার অনেক বাকি আছে এখনও। তাই নিঃসঙ্গতার আচ্ছাদনে নিজেকে কেবলই শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর দেখায়, ভাবনায়, পড়াশোনায়। তেমন আত্মদীক্ষার কিছু ছবি ধরা আছে তাঁর ডায়েরিগুলির মধ্যে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত লেখকের যে ন'খানি ডায়েরি' আছে তার পাতাগুলো ওলটালে বোঝা যায়, কতখানি বিনীতভাবে সত্যিকারের একজন লেখক এগিয়ে আসতে পারেন তাঁর লেখক জীবনের দিকে। দেখা যায় কীভাবে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গিয়েও প্রায়স্কুল ছাত্রের অধ্যবসায়ে দিনের পর দিন তিনি পড়ে যান মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা রাজনীতির বই, তার থেকে অংশের পর অংশ জুড়ে দেন তাঁর নিজের মন্তব্য, আর ভাবেন, কীভাবে সেখান থেকে পৌঁছবেন তাঁর নিজের গল্পের সীমানায়। এই ডায়রিগুলিতে একইসঙ্গে ধরা আছে স্পিনোজা থেকে লুকাচ, ঈশপ থেকে সিমোন দ্য বোভোয়া পাঠের কথা। একদিকে আছেন অ্যশলি মন্টেড, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সংগ্রহ করতে ভেবে লিখে রাখছেন বিদেশি বইগুলির নাম সাত্র, কামু, জনওয়েন বা কিংসলি অ্যামিসের নূতনতম রচনাবলী। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো বিবরণ, লেখা-না-লেখা অনেক গল্পের সূক্ষ্ম বীজ। ভাবছেন বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের সীমাবদ্ধতা, শিখছেন বাংলা বানানের টুকিটাকি, নূতন হিন্দি শব্দাবলী, ফরাসী বা রুশভাষার নানা নিয়ম। আর এরই মাঝে কখনো কখনো একটি দুটি ব্যক্তিগত মন্তব্য, সাহিত্য বা জীবন বিষয়ে তাঁর ধারণার একটি তির্যক রশ্মিপাত।

পরিণত পাঠকের মননশীলতা নিয়ে সতীনাথ যখন অবন ঠাকুরের লেখা বইগুলো পড়েন, তখন অভিভূত হন লেখকের কাহিনী বয়ন কৌশলের মুন্সীয়ানায়, স্বীকার করেন ছোটবেলাকার ভালো লাগার অসম্পূর্ণ ভাষা। ডায়রিতে ধরা আছে সেই তুলনামূলক অনুভূতির বিচার। অবনঠাকুরের লেখা ছোটবেলায় শক্ত লাগে। বড় হয়ে তার রসের অফুরন্ত স্বাদ পাওয়া যায়। ওঁর ছোটদের বই আসলে বড়দের জন্য লেখা ছোটদের বই। কথার বুনন তাঁর) মোজাইকের মত, বিচিত্র তাঁর রসের সম্ভার, কিন্তু ছোটছেলেরা যে রস চায় এ রস সে রস নয়। (১৯৫৪-র ডায়েরির) তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজে লেখক ও ঔপন্যাসিকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তাঁর মতে, সাহিত্যিক, কবি, ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তাও সে সমাজের কল্যাণে, জনতার কল্যাণে বেশি। লোকে আইনস্টাইন বোঝে না অথচ উপন্যাস বোঝে। তাই ঔপন্যাসিক Preference পান আইনস্টাইনের চেয়ে। কারণ লেখকের থাকে Sensitiveness of mind?

(ডায়েরি ১৯৫৪) সৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ঃ সৎ সাহিত্য মানব সমাজের কল্যাণে সৃষ্টি করা উচিৎ, একথা মেনে নিলেও সমস্যা থেকে যায়। মানুষের ভালমন্দ জিনিসটা কী? আজকে যেটাকে ভাল মনে করছ বা বেশির ভাগ লোক ভাল বলে স্বীকার করছে, একশো (বছর) পরে পেছু তাকিয়ে হয়ত দেখবে যে এটাই ছিল এযুগের কাল, মুখ্য দুর্বলতা। বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। (ডায়েরি)

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর ডায়েরির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ডায়েরির মধ্য দিয়ে পড়ুয়া লেখক ও চিন্তাশীল স তীনাথকে জানা যায়। জানা যায় তাঁর রচনা নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব, পাঠের ধরণ ও বিচার পদ্ধতির অভিনবত্বকে। সতীনাথের উপন্যাসগল্প কীভাবে খসড়া বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্মোক ত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ শিল্পসফল সৃষ্টি হয়েছে, তার বিবর্তন রেখাটিকে পর্যবেক্ষণেরজন্য ডায়েরিগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক সতীনাথ বাদুড়ী উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরি, ছড়া, কিছু প্রবন্ধ ও কবিতাও লিখেছেন। সমাজসচেতনতা, ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি, রাজনৈতিক পরিপক্কতা, বিচারবোধ, বিশ্লেষণশক্তি, পর্যবেক্ষণশক্তি বহুপঠিক প্রবন্ধগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ এমন একটা রম্য লালিত্য পেয়েছে যে তিনি বাংলার অন্যতম রস প্রাবন্ধিকের মর্যাদা পেতে পারেন। প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণশীল, বহুভাষাবিদ, পাঠক, পন্ডিত সতীনাথের পরিচয় পাই। যদিও সতীনাথের প্রবন্ধের কোন স্বতন্ত্র সংকলন নেই।

সতীনাথ তাঁর বন্ধু বিভূবিলাস ভৌমিককে একটি চিঠিতে (১৯৩১ সালে) লিখেছিলেন ঃ 'নবশক্তি পড় না বোধ হয়, ওতে আমার লেখা গোটা কয়েক Satire বেরিয়েছে।

সেই স্যাটায়ারধর্মী প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ - ('ইংলন্ডে গান্ধীজী') প্রবন্ধটিতে ইংরেজ রমণীদের চোখে কি বস্তু তা কৌতুকপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে, ইংরেজদের নিয়েও ব্যঙ্গ করেছেন লেখকঃ 'আমাদের দেশের খবর ওরা বড় একটা রাখে না। Zoo-র সাদা ভল্লুকটায় অরুচি হলে ওরা যতটা কাতর হয়, তার সিকিও হবে না যদি আজ ভূমিকম্পে আমাদের দেশের দশ লক্ষ লোক মারা যায়। তবেবhat fellow গ্যান্ডির নাম তারা শুনেছে। ওই naked faker টা থাকে Saint'-এর মতো, কিন্তু আসলে ও হচ্ছে একটা 'Sa', ও নাকি পাদরীদের তল্পিতল্প গুটোনোর নোটিস দিয়েছে। আর রিভেলিউশনারীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে ইংরেজ অফিসারদের বিরুদ্ধে। আজই Dover-এ গাড়ি আসবার অনেকক্ষণ আগে থেকেই স্টেশনে লোকের লোকারণ্য।

ট্রেন থামতেই মেমরা এক হাতে চোখ ঢাকলেন, আর এক হাতে ছিপিখোলা স্মেলিং সল্টসের শিশিটা নিয়ে ready হয়ে দাঁড়ালেন। তারপরে আস্তে আস্তে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গান্ধি নামছেন কিনা দেখতে লাগলেন, হঠাৎ নাগা সন্ন্যাসী দেখলে, সেইখানেই ফিট হওয়ার সম্ভাবনা কিনা, তাই।

সতীনাথ বিদেশ ভ্রমণ করেছেন একাধিকবার। ইংল্যা'র গ'ী পার হয়ে ইতালি ও ফরাসি মুলুকেও ভ্রমণ করেছেন। 'প্যারিস ও লন্ড ন' (দেশ শারদীয় ১৩৫৭) প্রবন্ধে ব্যবসাদার ল'ন আর আড্ডাবাজ প্যারিসের যে মেরুপ্রতিম পার্থক্য তা লেখকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে গেছে। প্যারিসে যেখানে জীবন উপভোগের বিচিত্র উপকরণ, হুল্লোড় এবং সংস্কৃতি মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন ল'ন জাগে স্টক এ'চেঞ্জের ওঠাপড়ায়; ঘুমকাতুরে ল'ন তাড়াতাড়ি শুতে যায়, দেরি করে ওঠে। রাত জাগানি প্যারিস দেরিতে শোয় আর জাগে ল'নের থেকে একঘন্টা আগে। প্যারি দেখতে হয় কাফে প্যাসিনোতে, অবসর যাপনরত লোকের আড্ডায়। এই ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের শহর, লোকের কাছে না এলে জানা যায় না। ল'নের ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে আলাদা... এখানে দেখতে হয় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি আর ব্যক্তিত্বহীন কর্মরত লোকের স্রোত।

লেখক প্যারিসের মতো ইতালিকেও খুব কাছে থেকে দেখেছেন। 'ম্যাকারোনির সখাতি' (দেশ ৩রা-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ইটালিয়ান গিন্নীদের ম্যাকারোনি রান্নার গর্ব, লক্ষ্য করেছেন ইটালির মেয়েদের স্নেহ - কোমল লালিত্য ও রসগ্রাহিতা, যেমন দেখেছেন লন্ডনের মেয়ের শ্রীহীনতাকে ও প্যারিসের মেয়ের চটকদারি সৌন্দর্যকে। শেক্সপীয়ারের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব নজরে পড়ে বলেছেন পরিহাসের সঙ্গে, মিলান শহর থেকে সমুদ্র যে বহুদূরে তিনি জানতেন না, তাই তিনি প্রসপারোকে মিলান বন্দর থেকে জাহাজে চড়িয়ে দেশান্তর পাঠিয়েছেন। ভেনিসের নগ্নমূর্তির ব্যাখ্যা করেছেন, ম্যাডোনা যীশুখৃষ্টের মূর্তি গড়েছেনগীর্জার জন্য, নগ্ন নরনারীর মূর্তি গড়েছে সঙ্গে সঙ্গেই গির্জার বাইরে, লোকের চাহিদা মেটাবার জন্য, নগ্ন মূর্তিগুলোতে দেখানো হয়েছে মানুষের দেহসুষমার অপরূপ ব্যঞ্জনা।

'পড়ুয়ার নোট থেকে' (দেশ, ৩০ আগষ্ট, ১৩৬২) প্রবন্ধে পাঠক সতীনাথ প্রুস্ত, কামু, ফকনার, বালজাক, টলস্টয় প্রভৃতি লেখকদের লেখার বৈশিষ্ট্য এবং গঠনরীতি সম্বন্ধে সুখপাঠ্য আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় যে সতীনাথ ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। কি অপূর্ব মূল্যায়ন করেছেন বিভিন্ন ফরাসী লেখকের রচনাবলীর। আলবেয়ার কামু -র নাম সবাই জানেন। তাঁর লেখাগুলি বাংলায় কেন অনূদিত হয় না? সে সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন লেখক। কামুর দুটি উপন্যাসের মধ্যে ৪'etranger' উপন্যাসটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম বলে তিনি মনে করেছেন।

সতীনাথের পৈতৃক নেশা ছিল গাছফুল পাখির নেশা। তাঁর উদ্যানপ্রীতির কথা নিয়ে বনফুল লিখেছেনঃ তাঁর বন্ধু ছিল তাঁর বাগানটি, গোলাপফুল আর অর্কিড সে ভালোবাসত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেনঃ 'তাহলে দেখছি আপনারও বাগানেরনেশা আছে। সাগরময় ঘোষ তাঁর সবচেয়ে বেশি রচনা ছাপিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর সঙ্গে একবারই মাত্র আর সেই একবারই শুধু গাছপালা আর ফুলবাগান নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি। গোপাল হালদার লিখেছেন যে সতীনাথের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ তাঁর বইপত্র নয়। সে সম্পদ তাঁর বাগান, তাই তিনি তাঁর নাম বলেন 'বাগানিয়া'।

এহেন সতীনাথ তাঁর 'হায় রবীন্দ্রনাথ' (সাহিত্যের খবর, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা) প্রবন্ধে সতীনাথের একটি অতি পরিচিত গাছকে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে শান্তিনিকেতনে এলে নীলমণিলতা নাম দিলে কবির অজ্ঞতা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি।

সতীনাথের সংস্কৃত ভাষার অনুরাগ বহন করে তাঁর 'আমি ও কালিদাস প্রবন্ধে' (দেশ, ৩রা বৈশাখ, ১৩৬৭) সতীনাথের উদ্যানপ্রীতি ও ঐ সম্বন্ধে তাঁর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার খবরও পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে পন্ডিত মহাশয়ের লেখকের উদ্দেশ্যে লতা-পাদপ - মিথুন-এর পরীক্ষা করবার প্রয়াস ও বৈজ্ঞানিক স্পৃহাকে ব্যঙ্গ করে শেষ কথাগুলো 'তুমি একটি বিবাহ কর যে কোন পদ্ধতিতে', ইঙ্গিতময় এবং সতীনাথ যেন নির্মমভাবে তার আত্মবিশ্লেষণ করেছেন।

'অনুসন্ধানী' প্রবন্ধে সতীনাথ অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বনফুলের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করছেন। অনায়াস বৈঠকী গল্প করার ভঙ্গিতে বনফুল সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতাপূর্ণ কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে গেছেন। বনফুল সতীনাথের কাছে 'বলাইদা'। শিল্পী বনফুলকে হৃদয়হীন বলতে বাধেনি, কারণ সাহিত্যিক বনফুল চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে, কোথায়ও ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে পাঠকের চোখ আর্দ্র করেন নি। ভোজনাবিলাসী বলাইদার পরিচয়ও লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়ে গেছেন।

সতীনাথের বিদেশী সাহিত্য বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ, প্রচুর অধ্যয়ন এবং রসাস্বাদন -এর অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। 'মধুসূদন ও লা ফঁতেন' প্রবন্ধে (দেশ, ৩০ পৌষ, ১৩৬৭) তারও পরিচয় পাই। এছাড়া এ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছেন, মধুসূদনের কাব্যসাহিত্যের একটা উৎসমুখ আবিষ্কার করেছেন। লাফঁতেনের 'ওকগাছ ও নলখাগড়া' কবিতাটি মূল ফরাসী ভাষা থেকে বাংলায় কবিতাছন্দে অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যে মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতার সঙ্গে কত বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে।

মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতায়ও এ মিল খুঁজে পেয়েছেন, একথাও বলেছেন, দুইজন কবির একই জায়গা থেকে মালমশলা নেওয়ার জন্য ও মাঝে মাঝে বিবরণে ও চিত্রণে সাদৃশ্য এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। সমালোচনার অধীত বিদ্যার অভিমান নেই, কাউকেছোট করার হীন প্রয়াস নেই, আছে বুদ্ধিশুভ্র সরলতার সঙ্গে অপূর্ব শালীনতাবোধ।

লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' -এর অন্যতম চরিত্র 'ঢোঁড়াই' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ (ঢোঁড়াই, সতীনাথ বিচিত্রা ১৩৭২) লিখেছিলেন সতীনাথ। উক্ত প্রবন্ধ থেকে ঢোঁড়াই চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও বিনয়ের সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাস রচনায় তাঁর শিল্পগত আন্তরিকতা সততা ও অতৃপ্তির কথা লিখেছেন- এত সব করে, শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই-এর চরিত্র যা দাঁড়াল, তাতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাইনি। চেষ্টার ত্রুটি আমার ছিল না; কিন্তু যে বিশালতা ও গভীরতা দিতে চেয়েছিলাম সে চরিত্রের, নিজের অক্ষমতার জন্য তা দিতে পারিনি। ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডুষ গল্পের মধ্যে, ধরতে পারিনি।

সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে সতীনাথের প্রবন্ধ 'দুইটি খেলা।' সৎ সাহিত্য সমালোচনাকে তিনি গভীর উদারতায় সৃজনশীল সাহিত্য বলে চিহ্নিত করে গেছেন।

এককথায় সতীনাথের প্রবন্ধগুলির হৃদয়গ্রাহী সরস বাচনভঙ্গী, ঋজুভাষা, যুক্তিপূর্ণ অভিমত ও তীক্ষ বিশ্লেষণ সতীনাথের উপন্যাস ও গল্পগুলির মত এগুলিও বৈশিষ্ট্য দাবি করে।